ট্রনিক অর্থাৎ ভারত-মার্কিন যুগ্ম গবেষণা, মন নিয়ন্ত্রনে। মার্কিন প্রতিরক্ষা সচিব তখন ছিলেন ক্যাসপার ওয়েন-বার্গার, উনি দিল্লী এসেছিলেন এবং রাজীবের সম্পাদিত চুক্তি প্রসঙ্গে দূতাবাসের ঘরোয়া ভোজ সভায় বলেছিলেন. "এত মেঘ না চাইতেই জল।" রাজীবও তৎকালিন মার্কিন প্রেসিডেন্ট রোনাল্ড রেগনের আমন্ত্রনে আমেরিকায় যান এবং হোয়াইট হাউসের বারান্দায় এবং মার্কিন সেনেটে দাঁড়িয়ে যে বক্তৃতা দেন তা দূরদর্শনের পর্দায় সারা ভারতবাসী দেখেছিল। যেহেতু আমেরিকার মন পসন্দ প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত চুক্তিপত্রে রাজীব সই দিয়েছিলেন তাই সি, আই, এর নির্দ্দেশে রাজীবকে মার্কিন মুলুকে বেশ ভাল রকমের মাইলেজ দেওয়া হয়েছিল, আড়ালে মিটিমিটি হাসছিলেন পি. ভি. নরসিমহা রাও। রাজীব গান্ধী দুন স্কুলের ছাত্র হলেও বৈজ্ঞানিক গবেষণা সংক্রান্ত বিষয় বোঝার মত শিক্ষাগত যোগ্যতা তার ছিল না। চুক্তির সময় রাজীবকে বোঝানো হয়েছিল যে সাইকোট্রনিক আসলে mental stretch পরিক্ষা করার জন্য এক বিশেষ ধরনের কম্প্যুটার যেটা রিমোট কন্ট্রোল দিয়ে চালানো হয়, তার জন্য সাটেলাইট লিঙ্কের প্রয়োজন এবং এই কম্প্যুটার নিয়ে ভারতীয় প্রতিরক্ষা বাহিনীর সদস্যদের mental stretch পরীক্ষা করা হবে এবং পরীক্ষার ফলাফল প্রমোশনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হতে পারে। চুক্তি হলো গোপনীয়তার অঙ্গীকারে। সাইকোট্রনিক কম্প্যুটার তার প্রয়োজনীয় পেরিফেরাল, হাইফ্রীকোয়েন্সী এ্যডাপ্টার প্রয়োজনীয় সফটওয়ার, সর্বাকছু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে এলো, বসান হোলো কলকাতার সল্টলেকে অবস্থিত ভাবা পরমাণু কেন্দ্রে, চূড়ান্ত গোপনীয়তার মধ্যে। স্যাটেলাইট লিঙ্ক দেওয়া হোলো ভারতীয় মহাকাশ গবেষণাগার ইসরো থেকে। প্রসঙ্গত ভাবা পরমাণু কেন্দ্র এবং ইসরো এই দুই প্রতিষ্ঠান প্রধানমন্ত্রীর অধীন, এবং এদের কাজে-কর্মে হস্তক্ষেপে কারোর কোন অধিকার নেই। এরা আইনের উর্দ্ধে এবং যা খুশী তাই করতে পারে। ভাবা পরমাণু কর্তৃপক্ষ প্রথম থেকেই ব্যবস্থা নিয়েছিল যাতে কোন অবস্থাতেই এই চূড়ান্ত গোপনতম ভারত-মার্কিন গবেষণা যেন বাইরের কেউ জানতে না পারে। আমেরিকান লবির মনপসন্দ জনৈক এন. কে. মুখার্জী, ডঃ শ্রীবাস্তব এবং পি. কে. থেমকা এই গবেষণার ব্যাপারে সর্বেসর্বা মনোনীত হন। এই গবেষণার অন্তিত্ব কি রকম গোপনীয় একটা ছোট উদাহরণ দিলে ব্যাপারটা দিনের আলোর মত স্পষ্ট হয়ে যাবে। আশির দশকের নাব্বামাঝি যখন এই মেশিন ভাবা পরমাণু কেন্দ্র কলকাতার সল্টলেকে বসান হয় তখন সল্টলেকের টেলিফোন একচেঞ্জের এরিয়া কোড ছিল ৩৭, অর্থাৎ সল্টলেকের সমস্ত টেলিফোনের নাম্বার ৩৭ দিয়ে শুরু হোতো। তখন এখনকার মত সাত সংখ্যার ফোন নম্বর প্রবর্তন হয়নি।

সল্ট লেকের ভাবা পরমাণু কেন্দ্রে যে ঘরে এই মেশিন বসানো হয়েছিল সে ঘরের টেলিফোন নম্বর ছিল ৩৭-১৭৬৭। কিন্তু সি, আই এর নির্দ্দেশ ছিল সমস্ত ব্যাপারটা হতে হবে অস্তিত্বহীন, মেশিন তো দূরের কথা কোন ফোন নম্বরের অস্তিত্বও থাকবে না এই সাইকোট্রনিক গবেষনায়। সেইজন্য কলকাতা টেলিফোনের ১৯৮৯ সালের টেলিফোন ডিরেক্টরির W-১৮৭ নং পৃষ্টায় দেখানো হচ্ছে জনৈক কে চ্যাটার্জীর নামে ফোন নম্বর ৩৭-১৭৬৭, অবস্থিত পি ৪৫/৩, এন্টালি সি, আই, টি রোডে, অথচ সবাই জানেন এন্টালি এলাকার তৎকালিন সমস্ত টেলিফোন ২৪ এক্সচেঞ্জের অধীন ছিল। সল্টলেক অর্থাৎ ৩৭ এক্সচেঞ্জের কোন টেলিফোন কোন অবস্থাতেই এন্টালি সি, আই টি রোডে অবস্থিত হতে পারে না। এটা করা হয়েছিল এইজন্য যাতে কোন অবস্থাতেই কেউ সাইকোট্রনিক গবেষণার সাথে ভাবা পরমাণু কেন্দ্রের যোগসূত্র স্থাপন করতে না পারে। কেননা, সেক্ষেত্রে কেঁচো খুঁড়তে সাপ বেরোতে পারে অর্থাৎ প্রতিরক্ষা, পরমাণু এবং মহাকাশ ক্ষেত্রে সি, আই, এর দালালরা ধরা পড়ে যেতে পারে। অনেকে হয়তো অবগত আছেন যে সোভিয়েত রাশিয়া যখন গায়ের জোরে আফগানিস্থান দখল করে তখন সি. আই এ এবং পাকিস্থানের গুপ্তচর